Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:78
April-June, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-05-14
Published: 2024-10-17

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i78.269

Suppression of Women and Children Repression (Amendment) Act, 2020 : A Review in the Light of Islamic Principles and Guidelines

Muhammad Saleh Uddin*
Muhammad Ismail**

Abstract

Men and women are integral members of human society. Although Islam has defined the mutual limits of the rights and dignity of men and women and honored women with rights, women have to face obstacles in enjoying their rights in various familial and social environment. Among the existing laws for the protection of the rights of women and children in Bangladesh, the 'Suppression of Women and Children Repression (Amendment) Act, 2020' is a significant one. As part of the qualitative research method, the 33 sections of the Act have been reviewed with the Islamic law by applying the comparative research method. In the comparative review of Conventional Law and Islamic Law, the issues relating to Ḥudūd (Fixed Punishment), Qiṣāṣ (Retaliation) and Ta'zīr (Discretionary Punishment) of penal law in Islam have been discussed in the relevant cases. Death penalty, imprisonment and fines have been provided as punishments for suppressing violence against women and children. In this study, it has become evident that the degree and types of all punishments stated in the aforementioned law are applicable in some cases in a comparative review with Islamic law, but in most cases, various issues like fine have emerged as conflicting with Islamic Law.

Keyword: woman, abuse, repression, discrimination, justice.

* Dr. Muhammad Saleh Uddin is an Associate Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka. Email: Salehjnu192@gmail.com

** Muhammad Ismail PhD Researcher, Department of Islamic studies, Jagannath University, Dhaka. Email: ismailtraders35@gmail.com

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ : ইসলামী নীতি ও নির্দেশনার আলোকে একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

নারী-পুরুষ মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য সদস্য। ইসলাম নারী ও পুরুষের অধিকার-মর্যাদার পারস্পরিক সীমা নির্ধারণ এবং নারীকে অধিকার দিয়ে সম্মানিত করলেও নারীদেরকে তাদের অধিকার ভোগে নানা পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বাধার মুখে পড়তে হয়। বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় বিদ্যমান আইনসমূহের মধ্যে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০' একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে এ আইনে বিদ্যমান ৩৩টি ধারা ইসলামী আইনের সাথে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনায় ইসলামে শাস্তি আইনের হুদুদ, কিসাস ও তাযির সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ গবেষণায় আইনে বিবৃত সকল শাস্তির মাত্রা ও ধরন ইসলামী আইনের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনায় কতিপয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডের ন্যায় বিভিন্ন বিষয় ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে ফুটে উঠেছে।

মূলশব্দ : নারী, অপব্যবহার, নির্যাতন, বৈষম্য, ন্যায়বিচার।

উপস্থাপনা

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে জীব হিসেবে সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমাজের দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতীয়মান। সৃষ্টির সূচনা থেকেই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নারী-পুরুষে আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি দিক থেকেও রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অধিকার। ইসলাম একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে নারীর সকল অধিকারের নিশ্চয়তা দিলেও এতৎসম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান না থাকায় নারীরা তাদের এ অধিকার ভোগ করতে পারছে না। একইসাথে বাংলাদেশের পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে নারী ও শিশুরা বিভিন্নক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত হয় এবং নির্যাতনের শিকার হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০' গ্রহণ করে। এ আইনে বিবৃত বিষয়াদি তথা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকারে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ইসলামী নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনায় অধিকাংশ আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামী আইন সমর্থিত হলেও বিভিন্ন ধারায় শাস্তির ধরনও মাত্রা ইসলামের শাস্তি আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। সর্বোপরি, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় এ আইনের ধারাসমূহের সাথে ইসলামী নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research)অনুসরণ করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে তুলনামূলক বা অনুবদ্ধ গবেষণা পদ্ধতি (Correlational research method) প্রয়োগ করা হয়েছে। তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতি হলো এমন একটি গবেষণা পদ্ধতি যার লক্ষ্য কোনো ধরনের প্রভাব ছাড়া দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা (J. Fraenkel et.al. 2012, 311)। বর্তমান তুলনামূলক গবেষণায় দুটি চলক হলো-

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন
২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে ইসলামী আইন

বিদ্যমান তথ্যগুলো পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এ গবেষণায় গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে এ গবেষণায় Content Analysis Method (আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি) প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০' কুরআন, হাদীস ও ফিকহের মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ : সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

১৯৮৩ সালে 'নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩' নামে একট আইন জারি করা হয়। কিন্তু এ আইন কার্যকর হওয়ার পর এর মধ্যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত অপরাধ ও অপরাধের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় নারী নির্যাতনের অপরাধ দমনে আইনটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে 'নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশটি রহিত করা হয়। পরে মামলা পরিচালনাকালে এ আইনেরও কিছু সীমাবদ্ধতা, অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন কার্যকরভাবে দমন করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন পাস করে ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনটি বিলুপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন)' শিরোনামে এ আইনের কতিপয় ধারায় সংশোধনী আনা হয়। সর্বশেষ ২৬ নভেম্বর, ২০২০ সালে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২২ নং আইন)' শিরোনামে এ আইনের কতিপয় ধারায় সংশোধনী আনা হয়।

ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে পর্যালোচনা

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০' শীর্ষক এ আইন নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং নারী নির্যাতনসংক্রান্ত অপরাধসমূহ দমনের লক্ষ্যে শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছে। এ আইনের বিশেষ দিকসমূহ ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে পর্যালোচনা করা হলো:

১. মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার শাস্তি (ধারা-৪.১)

উক্ত আইনে মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার জন্য একই শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এগুলো হলো:

ক. মৃত্যুদণ্ড
খ. কারাদণ্ড
গ. অতিরিক্ত হিসেবে অর্থদণ্ড

ইসলামী আইনের সাথে আইনের এ ধারার ৬টি বিবেচ্য বিষয়ের পর্যালোচনা প্রয়োজন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তা উল্লেখ করা হলো:

১.১ : দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড

দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর বিষয়টি ইসলামী আইনে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা'(قتل العمد) এর অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামে কিসাসের বিধান রয়েছে।[১] এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾

হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে (al-Qur'ān: 2:178)।

সুতরাং, এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধানটি ইসলামী আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১.২ : দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড

প্রচলিত আইনে দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে, অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বিচারকের এখতিয়ার রয়েছে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া। এ বিধানটি ইসলামী আইনের সাথে একঅর্থে মিল থাকলেও অন্যদিক থেকে সাংঘর্ষিক। এক্ষেত্রে ইসলামী কিসাস আইনের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দৃশ্যমান বিষয় হলো, ইসলামী আইনে কিসাস তথা হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধানটি নিহতের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের ওপর নির্ভরশীল, তথা তারা যদি কিসাসের আবেদন না করে অথবা কিসাসযোগ্য অপরাধের অপরাধীকে ক্ষমা করে দেন সেক্ষেত্রেই কেবল বিচারক তাযিরিশাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিতে পারবেন। নিহতের উত্তরাধিকারীদের কিসাসের আবেদন থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান আইনে বিচারকের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের এখতিয়ার থাকাটি ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। হুদুদের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্ষমা করা জায়িয নয় (এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া ক্ষমা করার শামিল), কেননা হদ্দ আল্লাহর হক। তবে কিসাসের মধ্যে যেহেতু বান্দার হকের প্রাবল্য রয়েছে, তাই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের কিসাসের দাবী করার অধিকার কিংবা তার পরিবর্তে দিয়াত কিংবা বিনা

১. ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় অপরাধীকে তার অপরাধ সদৃশ শাস্তি প্রদানকে কিসাস বলা হয়। যেমন হত্যার বদলায় হত্যা করা এবং যখমের বদলায় যখম করা। (Ibn al-Manẓūr 1414H., 8:341)

বিনিময়ে ক্ষমা করার অধিকারও রয়েছে। সর্বোপরি, বাদীর দাবী থাকলে শাসকের পক্ষে তা ক্ষমা করা জায়িয নয়। তদুপরি সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ যেখানে জড়িত, সে ক্ষেত্রে বাদী অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেও শাসকের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া জায়িয (Editorial Board 1995, 30:184-186)।

নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী কর্তৃক ক্ষমা করার বিধান সম্পর্কে কুরআনের বাণী:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾

আর আমি এতে তাদের ওপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে (al-Qur'ān: 5:45)।

১.৩ : মৃত্যু ঘটানোর শাস্তির অতিরিক্ত হিসেবে অর্থদণ্ড (১ লক্ষ টাকা)

এ আইনের ধারানুসারে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো, হদ্দযোগ্য অপরাধের শাস্তির পাশাপাশি অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ার বৈধতা। এ বিষয়ে ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী হদ্দের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধীকে একই সাথে তাযিরের আওতায়ও শাস্তি দেয়া সমীচীন নয় (Ali 2015, 45)। অর্থাৎ, হদ্দযোগ্য অপরাধ কিসাস বাস্তবায়নের পাশাপাশি তাযিরের আওতায় অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া সমীচীন নয়। কিন্তু জনস্বার্থ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে একই সাথে উভয় ধরনের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে হদ্দের মাত্রা বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ড একটি ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। ইমাম মালিক রহ বলেন, মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে একই সাথে হদ্দ ও তাযিরের শাস্তি প্রদান করা যায় (al-Ḥaṭṭāb ND, 6:247)। সুতরাং মৃত্যুদণ্ডের বাইরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাথে অতিরিক্ত দণ্ড দেয়া ইসলামী শরীয়তে বৈধ।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো, অর্থদণ্ডের শরয়ী বৈধতা। উক্ত আইনে মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ডের পাশাপাশি অতিরিক্ত দণ্ড হিসেবে অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী আইনে অর্থদণ্ডের শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, তাযির হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়, এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ রহ. প্রথমে জায়িযের মত পোষণ করলেও পরবর্তীতে সে মত থেকে ফিরে আসেন। তাঁর নতুন মত অনুযায়ী অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয নয়। হাম্বলী ইমামগণের মতে, অর্থ জরিমানা করা হারাম। অনুরূপভাবে শাস্তি হিসেবে সম্পদ বিনষ্ট করাও হারাম। তাঁদের কথা হল, এ বিষয়ে শরীয়তের নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ রহ. ও অধিকাংশ মালিকী মতাবলম্বী ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয, যদি তাতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে (Ibn 'Ābidīn 1992, 4:61)। শায়খুল ইসলাম

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয। তাঁদের কথা হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায় (Ibn Taymiyyah N.D. 4:211-2)। যেমন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ﷺ বললেন,

مَنْ اَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ

অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায, কোন উপায়ে তা ছিঁড়ে নেয় নি, তা খেলে তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যে তা কোন জিনিসের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে (Abū Dāwūd1420H, 4390)।

তাছাড়া খোলাফায়ে রাশেদা যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশও জরিমানা হিসেবে নিয়ে নিতেন (Ibn al-Qayyim ND, 227)। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ নয়। সর্বোপরি সাধারণ অবস্থায় অর্থ জরিমানার শাস্তি না দেয়াই হল মূল বিধান। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ কোন অপরাধের ক্ষেত্রে (যেমন চুরি, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি) অর্থ জরিমানা প্রদান করতে পারে। তবে সরকার সে অর্থ রাজকোষে জমা করতে পারবে না এবং কোন সম্পদশালীকেও দিতে পারবে না; বরং তা অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তৃতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো, ইসলামী আইনে দিয়াতের মাধ্যমে সমঝোতার সুযোগ। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছাধিকারের মাধ্যমে কিসাস অথবা দিয়াত[২] (রক্তমূল্য, অর্থদণ্ড) নিতে পারবে। অর্থাৎ, হত্যাকৃত ব্যক্তির অভিভাবকগণ, কিংবা যার ওপর সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে তার অভিভাবকগণ কিসাসের বিনিময়ে রক্তপণে (দিয়াতে) সম্মত হয় তাহলে কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত কার্যকর করা হবে (al-Ḥajāwī ND., 6:6)। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا اَنْ يُودَى، اَوْ يُقَادَ

যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে, তার দুটি এখতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছে করলে রক্তমূল্যও নিতে পারবে, ইচ্ছে করলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারবে (Abū Dāwūd 1420H, 4505)।

২. দিয়াত হলো খুনের বদলায় হত্যাকারীর ওপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদেয় সম্পদবিশেষ। মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে অপরাধের বদলায় অপরাধীর ওপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় সম্পদকেও দিয়াত বলা হয়। (al-Jurjānī 1405H, 1:142)

উক্ত হাদীসের আলোকে দৃশ্যমান হয় যে, দিয়াত প্রদানের শর্তে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের হত্যাকারীর সাথে সমঝোতা করার এখতিয়ার রয়েছে। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, দিয়াত প্রদানে হত্যাকারীকেও সম্মত হতে হবে। হত্যাকারীর সম্মতি ছাড়া জোর করে দিয়াত হিসেবে অর্থদণ্ড আদায় করা বৈধ নয় (al-Sarakhsī 1993, 26:60-63)। কেননা হত্যার অপরাধে তার জীবন ধ্বংস করা বৈধ হলেও তার সম্পদ দখল করা বৈধ নয়। তাই দিয়াত হিসেবে অত্যধিক বেশি অর্থদণ্ড দাবি করা বৈধ নয়। এটি অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করার শামিল, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

তবে হাম্বলীগণের মতে হত্যাকারীর সম্মতি ছাড়া তার নিকট থেকে দিয়াতের অর্থ জোর করে আদায় করা বৈধ হবে যেমন ক্ষতিপূরণের অর্থ জোর করে আদায় করা যায় (al-Mardāwī ND, 10:3)।

দিয়াতের পরিমাণ ১০০ উটনী নিয়ে সকল ইমাম একমত হলেও ১০০ উটনীর বয়স সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ লক্ষণীয়। শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণ এবং হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. প্রমুখের অভিমত হলো, দিয়াতের জন্য ১০০ উটনীর মধ্যে ৩০টি ৪ বছর বয়সের, আর ৩০টি ৩ বছর বয়সের উট এবং ৪০টি গর্ভবতী উটনী হতে হবে। দিয়াতের পরিমাণ হল- ৩০টি ৩০ বছর বয়সের, ৩০টি ৪ বছর বয়সের এবং ৪০টি গর্ভবতী উটনী। আর যদি তারা সমঝোতা করে তবে যে পরিমাণের বিনিময়ে সমঝোতা হয়েছে, তাই তারা পাবে। এ বিধান দিয়াতে কঠোরতা সৃষ্টির জন্য আরোপ করা হয়েছে।" (Ibn Mājah 1998, 2626) অন্যান্য ইমামের মতে ১০০ উটের মধ্যে ২৫টি ৪ বছর বয়সের ও ২৫টি ৩ বছর বয়সের উট, আর ২৫টি ২ বছর বয়সের উটনীএবং ২৫টি ১ বছর বয়সের উটনী হতে হবে (Ibn Qudāmah 1417H, 8 :293-4)। নিহতের অভিভাবকদের জন্য সমঝোতার ক্ষেত্রে এ পরিমাণের বেশি দাবি করা বৈধ নয়। অবশ্যই এর কম পরিমাণের ওপরও সমঝোতা করা যেতে পারে।

সুতরাং বর্তমান আইনে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডের বিষয়টি ইসলামী আইনে বর্ণিত ১০০টি পশুর বাজারদর বিবেচনায় অনেক কম, এ বিষয়ে বিদ্যমান আইনের সংশোধন করে ১০০টি পশুর বাজারদর গড় বয়স ২ বছর বিবেচনায় নিয়ে সর্বনিম্ন ২০ লক্ষ টাকা করা যেতে পারে।

চতুর্থ বিবেচ্য বিষয় হলো, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি বিবেচনায় বিচারক তাযিরি শাস্তির আওতায় কারাদণ্ড, নির্বাসন, বয়কট, বেত্রাঘাতসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন। তবে কোনো শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করা যদি বিচারক কিংবা প্রশাসকের কাছে সার্বিক দৃষ্টিতে অধিক কল্যাণকর বিবেচিত হয়, তাহলে তা ক্ষমা করা জায়িয হবে এবং এজন্য সুপারিশও করা যাবে। সর্বোপরি তাযিরাত যদি মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের দাবী আমলে নিতে হবে। আর যদি তা আল্লাহর অধিকারের সাথে জড়িত হয়, তাহলে

উত্তরাধিকারীদের দাবী আমলে নেয়া হবে না (Editorial Board 1995, 17:136)। এক্ষেত্রে মালিকী মাযহাবের মতে, যদি কোন কারণে কিসাস বা দিয়াত বা দুটিই রহিত হয়ে যায়, তবুও হত্যাকারীরকে একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে। অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, হত্যাকারী পেশাদার দুষ্কৃতিকারী হলে সরকার তাকে তাযিরের আওতায় যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারবে (Ibn Rushd, 1981, 2:338)।

১.৪ : মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড

ইসলামী আইন অনুসারে মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা কোনো হদ্দযোগ্য অপরাধ নয়, তাই এর কোনো নির্ধারিত শাস্তি নেই। এক্ষেত্রে বিচারক তাযিরি শাস্তি হিসেবে দণ্ড আরোপ করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তাযিরের আওতায় কাউকে হত্যা করা সমীচীন নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

> আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। (al-Qur'ān: 6:151)

এ আয়াতে বর্ণিত বৈধ কারণ বলতে হাদীসে তিনটি কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি ছাড়া কোন মুসলিমের রক্ত হালাল হবে না। এ তিন ব্যক্তি হলো, অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী এবং মুসলিম দল ও ধর্মত্যাগকারী ব্যক্তি (al-Bukhārī 1422 H, 6484)।

কুরআনের এ আয়াত ও হাদীস অনুসারে দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া শরীয়া আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে অধিকাংশ ইসলামী আইনতত্ত্ববিদের মতে, কেউ কোন মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত করলে কিংবা কোন বড় অপরাধ বারংবার সংঘটিত করলে জাতীয় ঐক্য, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে তাযির স্বরূপ তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা জায়িয (Ibn Nujaim ND, 5:123)।

১.৫ : মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড

এ ধারাটি ইসলামী আইন সমর্থন করে। এক্ষেত্রে তাযিরি শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া যাবে। কেননা তাযির হিসেবে অপরাধীদেরকে প্রয়োজনে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম বা বিনা শ্রমে কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কখনো পরিস্থিতি এরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, অপরাধীকে বন্দী করে রাখা না হলে তার কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতে পারে। এ ধরনের অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলে তাকে যেমন তার কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে, তেমনি এ আশাও করা যেতে পারে, কারাগার থেকে মুক্তির পর সে কারাজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা স্মরণ করে কোন অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। এ কারণে কারাগারের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে কয়েদীরা

সেখানে এক অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে ছটফট করতে থাকবে। তা হলেই পরবর্তী জীবনে এ দুঃসহ অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা আর যে কোন অপরাধে লিপ্ত হতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে না (Ali 2015, 317)। মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার জন্য কারাদণ্ডের বিধান রাখা হলেও ইসলামী আইনে বিচারক তাযিরি[৩] শাস্তির আওতায় কারাদণ্ড ছাড়াও নির্বাসন, বয়কট, বেত্রাঘাতসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন।

১.৬ : মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড (১ লক্ষ টাকা)

তাযিরি শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড দেয়ার বিষয়ে আলিমদের মাঝে দ্বিমত থাকলেও বিশেষ প্রয়োজন হেতু বিচারক উক্ত দণ্ড দিতে পারেন। বিষয়টি ১.৩ পয়েন্টে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার জন্য অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হলেও ইসলামী আইনে বিচারক তাযিরি শাস্তির আওতায় কারাদণ্ড, নির্বাসন, বয়কট, বেত্রাঘাতসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন।

২. অঙ্গহানির জন্য মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত হিসেবে অর্থদণ্ডের বিধান (ধারা-৪.২)

এখানে ইসলামী আইনের আলোকে কিসাস প্রযোজ্য হবে। অপরাধী কোন ব্যক্তির দেহের যতটুকু ক্ষতিসাধন করবে কিসাসস্বরূপ তার দেহেরও ঠিক সে অঙ্গের ততখানি ক্ষতি করা হবে। এ ধরনের কিসাস সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾

সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে (al-Qur'ān: 2:194)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ﴾

তাদের জন্য আমরা তাতে বিধান নির্ধারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম (al-Qur'ān: 5:54)।

"যখমের পরিবর্তে অনুরূপ যখম" কথা দ্বারা বোঝা যায়, যেসব ক্ষেত্রে যখমের সমপরিমাণ বদলা নেয়া সম্ভব, কেবল সে ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হবে এবং যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে দিয়াত অথবা অন্য কোন সাধারণ দণ্ড কার্যকর হবে (Ali 2015, 267)। অর্থাৎ, যদি যখমের পরিবর্তে তথা অঙ্গহানির অনুরূপ কিসাস গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাযিরি শাস্তির মাধ্যমে দিয়াত বা অন্য কোনো শাস্তি দেয়া হবে।

সুতরাং প্রচলিত আইনে মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত হিসেবে অর্থদণ্ডের বিধান

৩. তাযির শব্দের অর্থ হলো বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় তাযির হলো- আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরিয়ত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তাযির বলে (Ibn al-Humām ND, 4:412)।

ইসলাম সমর্থন করে না। তবে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ করতে পারে। তবে কিসাস গ্রহণ করতে দিয়াত দাবী করার এখতিয়ার তার থাকবে না (al-Kāsānī ND, 7:297-8)। এছাড়াও মানবদেহের বিরুদ্ধে যে কোন অপরাধের জন্য কিসাস কার্যকর করা সম্ভব না হলে অথবা কিসাস কার্যকর করলে অপরাধীর সমপরিমাণের অধিক শাস্তি পাওয়ার বা মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকলে অপরাধীর ওপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হয় (Ali 2015, 289)। এক্ষেত্রে শরীরের যে সকল অঙ্গ একটি করে সেগুলোর জন্য এবং যেসকল অঙ্গ দুটি করে সেগুলো দুটিই কর্তন করলে পূর্ণ দিয়াত তথা ১০০ উট তার সমপরিমাণ অর্থ। এভাবে তুলনাযোগ্য হবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলো। যেমন- ১০ আঙ্গুলের মাঝে একটি কর্তন করলে ১০টি উট (al-Sarakhsī 1993, 26:70)।

তবে বিচারক অপরাধ, অপরাধীর অবস্থা ও পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনায় তাযিরি শাস্তির আওতায় কারাদাণ্ডসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারে।

৩. দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ নিক্ষেপের ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি না হলেও কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত হিসেবে অর্থদণ্ডের বিধান (ধারা-৪.৩)

আপাতদৃষ্টিতে এ বিষয়ে সরাসরি শরয়ী কোনো হদ্দ না থাকলেও মানব বিধ্বংসী অপরাধের অভিপ্রায় বিবেচনা করে বিচারক তাযিরি শাস্তির আওয়ায় যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন।

৪. নারী ও শিশু অপহরণের জন্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান (ধারা-৭ ও ৮)

ইসলামী আইনেও অপহরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে অপহরণ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় শাস্তির ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনা করে বিচারক অপহরণকারীকে কারাদণ্ড কিংবা বেত্রাঘাত অথবা উভয়বিধ শাস্তি দিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, অপহরণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার যেমন খর্ব হয়, তেমনি জনস্বার্থও বিঘ্নিত হয়। তাই অপহরণের মামলা আদালতে উপস্থাপিত হবার পর সন্তানের মালিক যদি তাকে ক্ষমাও করে দেয়, তা হলেও বিচারক জনস্বার্থ বিবেচনা করে এবং সমাজে সার্বিক ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে শাস্তিকার্যকর করবে; তাকে ক্ষমা করে দেবে না (Editorial Board 1995, 31: 235)। অপহরণের ক্ষেত্রে বিশেষত চার ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে-

- যদি কেউ অপর কোন মানুষকে ছোট হোক বা বড়- অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে কোন কাজে খাটায়, তা হলে তাকে তার কাজের যথাযথ পারিশ্রমিক আদায় করে দিতে হবে। আর যদি কোন কাজে না খাটিয়ে কেবল আটকে রাখা হয়, তাহলেও যেহেতু অপহরণকারী তার উপার্জনের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে, তাই তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (Editorial Board 1995, 13:37)।

- যদি অপহৃত ব্যক্তি অপহরণকারীর কাছে থাকা কালে কোন কারণে নিহত হয় কিংবা হিংস্র কোন প্রাণীর আঘাতে বা সাপের দংশনে মারা যায় অথবা দেয়াল বা ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়, তাহলে অপহরণকারীকে তার রক্তপণ আদায় করতে হবে। যদি হঠাৎ কিংবা জ্বরে মারা যায়, তাহলে তার রক্তপণ আদায় করতে হবে না (Ibn Qudāmah ND, 5:175)।
- যদি কেউ কোন মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, তাহলে অপহরণকারীর ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করতে হবে। অধিকন্তু তাকে মহিলাটির যথাযোগ্য মাহর সমপরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে (Editorial Board 1995, 31: 148)।
- মুক্তিপণ আদায়ের জন্য নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি অর্থদণ্ডের বিধানটিও তাযিরি শাস্তির আওতায় বিবেচ্য।

৫. ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান (ধারা-৯)

উক্ত আইনে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ডের বিধান রাখা হলেও ইসলামী আইনে এ অপরাধকে অত্যন্ত শাস্তিযোগ্য বিবেচনায় কঠোর শাস্তির বিধান নির্ধারণ করেছে। এ আইনে বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যক্তির ধর্ষণের একই শাস্তি রাখা হলেও ইসলামী আইনে শাস্তির কঠোরতা বিবেচনায় বিবাহিতকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিতকে বেত্রাঘাত ও কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ধর্ষণের শাস্তির বিধানগুলো হলো:

ক. বেত্রাঘাত করা: এ ব্যাপারে ইসলামী আইনজ্ঞগণ একমত যে, যদি কোন অবিবাহিত নারী বা পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর তা স্বীকৃতি বা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তবে ইসলামী আইনে তার শাস্তি হলো একশত কশাঘাত:চাবুক মারা:কোড়া মারা ইত্যাদি। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ﴾

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে (al-Qur'ān: 24:2)।

খ. নির্বাসন: ইমাম আবু হানিফার মতে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে একশত কশাঘাতের পাশাপাশি নির্বাসন দেয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রহ. সহ একদল মুজতাহিদের মতে, অবিবাহিত ব্যভিচারীদেরকে একশত কশাঘাতের পাশাপাশি তাযিরি শাস্তি হিসেবে এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। এ সম্পর্কে হাদীসের বাণী, উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ

তোমরা আমার থেকে বিধান গ্রহণ কর। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বিধান ফায়সালা করে দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষের সাথে অবিবাহিত নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে একশত কশাঘাত এবং এক বছর নির্বাসন। আর বিবাহিত নারীর সাথে বিবাহিত পুরুষ যিনায় লিপ্ত হলে একশত কশাঘাত এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা (Muslim 1999, 12:1690)।

সর্বোপরি বিচারক প্রয়োজন ও কল্যাণকর মনে করলে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে পারবে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্বাসন দেয়ার ফলে সংশোধনের পরিবর্তে আরো অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকায় নির্বাসনের পরিবর্তে এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। এর দলিল হলো, আলী রা. বলেন,

فِي الْبِكْرَيْنِ اِذَا زَنَيَا يُجْلَدَانِ وَلَا يُنْفَيَانِ وَاِنَّ نَفْيَهُمَا مِنْ الْفِتْنَةِ.

দুজন অবিবাহিত নারী-পুরুষ যখন ব্যভিচার করে, তখন তাদেরকে কশাঘাত করা হবে, নির্বাসন দেয়া যাবে না, কেননা তাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে (al-Jaṣṣāṣ 1405H, 5:95)।

গ. প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা : সকল আলিমের ঐকমত্য হয়েছে যে, যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কিংবা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তার শাস্তি হলো রজম বা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা। এর দলিল হলো সে আয়াত যার তিলাওয়াত রহিত হয়েছে কিন্তু বিধান কার্য আছে। ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, উমর রা. বলেন,

رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি (Ibn Mājah 1998, 2553)।

ইসলামী আইনে ধর্ষণের কঠোর শাস্তির বিধান থাকার পাশাপাশি এ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ছে। এজন্য চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষের সাক্ষী প্রয়োজন। কোনো ধরনের সন্দেহ অথবা অনুমানের ভিত্তিতে ধর্ষণের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

ঘ.জনসম্মুখে শাস্তি দেয়া : জনসম্মুখে শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে জনগণকে ঐ অপরাধের ভয়াবহতার ব্যাপারে সাবধান করা যায় এবং জনসম্মুখে শাস্তি কার্যকর করার মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পায়; তাই ইসলামী আইন জনসম্মুখে বাস্তবায়ন করার বিধান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে (al-Qur'ān: 24:2)।

৬. ধর্ষণ চেষ্টার জন্য কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান (ধারা-৯.৪)

ধর্ষণের ন্যায় ধর্ষণের প্রচেষ্টাও একটি গর্হিত অপরাধ। এ আইনের ৯.৪.খ ধারায় ধর্ষণের চেষ্টার জন্য সর্বোচ্চ ১০ বছর কিন্তু সর্বনিম্ন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে, যা ইসলামী তাযিরি শাস্তির আওতায় সমর্থনযোগ্য।

৭. হেফাজতে ধর্ষণের জন্য হেফাজত প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তিদের কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান (৯.৫)

এ আইনের ৯.৫ ধারায় পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের অপরাধে যাদের হেফাজতে ছিলো অর্থাৎ, হেফাজত প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তিদেরকে ব্যর্থতার দায়ে শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ ১০ বছর কিন্তু সর্বনিম্ন ৫বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে, যা ইসলামী তাযিরি শাস্তির আওতায় সমর্থনযোগ্য।

৮. নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনার জন্য কারাদণ্ডের বিধান (ধারা-৯.ক)

আত্মহত্যা ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু (al-Qur'ān: 4:29)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্মহত্যার অপরাধ সম্পর্কে বলেন :

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বস্তু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি প্রদান করা হবে। (al-Bukhārī 1422H., 6047)

আত্মহত্যা তো দূরের কথা, মৃত্যু কামনা করাও বৈধ নয়। সাইয়িদুনা আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللّٰهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

তোমাদের কেউ যেন কোনো বিপদে পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। মৃত্যু যদি তাকে প্রত্যাশা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ আমাকে সে অবধি জীবিত রাখুন, যতক্ষণ আমার জীবনটা হয় আমার জন্য কল্যাণকর। আর আমাকে তখনই মৃত্যু দিন যখন মৃত্যুই হয় আমার জন্য শ্রেয় (Muslim 1999, 10:2680)।

সুতরাং কোনো ধরনের প্ররোচনায় আত্মহত্যা করা যাবে না। তবে এ আইনে আত্মহত্যার প্ররোচনা বলতে অসহ্য নির্যাতন চালানোকে বোঝানো হয়েছে, যার ফলে তার জন্য দুনিয়ায় বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। যেকোনো ধরনের নির্যাতনই ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। তাই নির্যাতনকারীকে ইসলামের দণ্ডবিধির আলোকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং নির্যাতিতাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

৯. যৌন পীড়নের জন্য কারাদণ্ডের বিধান (ধারা-১০)

ইসলামে এ ধরনের অপরাধের হদ্দ তথা নির্ধারিত দণ্ডবিধি নেই; তবে এ ধরনের অপরাধকে তাযিরি শাস্তির আওতাভুক্ত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলাম যৌনপীড়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক নির্দেশনা প্রদান করেছে, সেগুলো হলো-

৯.১ দৃষ্টিশক্তির হেফাযত : যৌন পীড়নের সবচেয়ে ক্ষতিকর যে কারণ তা হলো কুদৃষ্টি তথা লোলুপ দৃষ্টি। তাই যৌন পীড়ন প্রতিরোধে ইসলামে বর্ণিত দৃষ্টি সম্পর্কিত ফোজদারী আইনের বাস্তবায়ন দরকার। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ﴾

ঈমানদার পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে (al-Qur'ān: 24:30)।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলো থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার পরিবর্তে তাকে এমন ঈমান দান করবে যার মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে।" (al-Ṭabarānī N.D., 10362)।

৯.২ সতর ঢেকে রাস্তায় চলাচল : সতর না ঢেকে উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ চলাচলের প্রভাবে সমাজের যুবকদের সুপ্ত যৌন আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। যার প্রভাবেই মূলত যৌন পীড়নের ন্যায় অপরাধের উৎপত্তি। তাই রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় সতর ঢেকে পর্দা পরিপালন করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا بَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾

হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম (al-Qur'ān: 7:26)।

সুতরাং প্রতিটি নারীর জন্য উচিত হবে রাস্তায় চলাচল অথবা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সামনে যেতে হলে অবশ্যই তাকে সতর আবৃত করে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে যায় তা ব্যতীত (al-Qur'ān: 24:31)।

অর্থাৎ, মহিলারা কেবল তাদের শরীরের ঐ অংশগুলোই খোলা রাখতে পারবে, যা স্বভাবতই প্রকাশিত থাকে। এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর অর্থ হাতের তালু, চেহারা ও আংটি (al-Jāssās 1405H., 5:172)। এ মতানুসারে চেহারা সতরের অংশ নয়, কেননা হাতের তালুর ন্যায় চেহারাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. স্বভাবতই প্রকাশমান বলেছেন। তবে সতর ঢেকে রাখার উদ্দেশ্য বিবেচনায় মুখমণ্ডলের গুরুত্ব তুলে ধরে আল্লামা আলী আস সাবুনী রহ. বলেন, "মুখমণ্ডল হচ্ছে সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিপর্যয়ের উৎস এবং বিপদের ঘাঁটি"(al-Ṣābūnī 1980, 2:156)।

তিনি আরো বলেন, মহিলাদের দিকে তাকানো জায়েয নয় শুধু ফিতনার আশংকায়। আর চেহারা খোলা থাকলে যে ফিতনার সৃষ্টি হয় তা পা, নলা এবং চুল খোলা রাখার চেয়েও মারাত্মক। যেখানে পায়ের নলা এবং চুলের দিকে তাকানো সর্বসম্মতভাবে হারাম হয়েছে সেখানে চেহারার দিকে তাকানো আরো বেশি হারাম হওয়া উচিত।

কারণ তা হচ্ছে সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু, ফিতনা বা বিপর্যয়ের উৎস এবং অনিষ্টের কার্যকরণ (Ibid)।

৯.৩ রাস্তায় আড্ডা না দেয়া : আজকের সমাজে যে স্থানে যৌন পীড়ন বেশি হয় তা হল রাস্তা, ঘাট, বাজার, বিপণি বিতান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অথচ এসব ব্যাপারে ইসলামের বিধান যদি মানা হত তাহলে মনে হয় ইভটিজিং নামক শব্দটির উদ্ভব হত না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী,

إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا ، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ.

তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। সাহাবীগণ বললেন, আমাদেরতো রাস্তার উপরে বসা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই, যেখানে বসে আমরা আলাপ করি। রাসূল বললেন– যখন তোমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া উপায় থাকে না, তখন তোমরা রাস্তার হক আদায় করে বসো। তাঁরা আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! রাস্তার হক কী'? তিনি ﷺ বললেন, রাস্তার হক হল : চক্ষু অবনত করা। কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের জবাব দেয়া। সৎকাজের আদেশ করা। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা (al-Bukhārī 1422 H., 2465)।

৯.৪ নারীদের রাস্তায় নম্রভাবে চলাচল : ইসলামী অনুশাসন হল নারীরা সাবধানতার সাথে রাস্তার একপাশ দিয়ে চলাচল করবে নম্রভাবে। কিন্তু তারা যদি অহংকারের সাথে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করে। তবে তাদের যৌন পীড়নের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যায়। তাই ইসলামী অনুশাসন মান্য করা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে (al-Qur'ān: 24:31)।

হামযা বিন আবি সাঈদ আনসারী রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম ﷺ কে নারীদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছেন,

اسْتَأْخِرْنَ، لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ حَافَّاتِ الطَّرِيقِ " فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالشَّيْءِ يَكُونُ فِي الْجِدَارِ مِنْ لُزُومِهَا بِهِ

তোমরা পেছনে চল। কেননা, রাস্তার মধ্যখান দিয়ে চলা তোমাদের জন্য উচিত নয়; বরং রাস্তার একপাশ দিয়ে তোমাদের চলা উচিত। একথা শুনে নারীরা প্রাচীর ঘেঁষে চলতে লাগল। এমনকি তাদের কাপড় প্রাচীরের সাথে লেগে থাকা বিভিন্ন বস্তুর সাথে লেগে যেতো (al-Bayhaqī 1423H., 7437)।

সুতরাং নারীগণ রাস্তার এক পাশ দিয়ে হিজাবসহ শালীনভাবে চলবে।

১০. যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ও অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান (ধারা-১১.ক)

এখানে ইসলামী আইনের আলোকে কিসাস প্রযোজ্য হবে।[৪]

১১. যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টার শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড (ধারা-১১.ক)

এ ধারাটি ইসলামী আইন সমর্থন করে। এক্ষেত্রে তাযিরি শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া যাবে।[৫]

১২. যৌতুকের জন্য যখমের শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড ও অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান (ধারা-১১. খ,গ)

এখানে ইসলামী আইনের আলোকে কারাদণ্ডের পরিবর্তে কিসাস প্রযোজ্য হবে।[৬]

১৩. ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত হিসেবে অর্থদণ্ডের বিধান (ধারা-১২)

এখানে ইসলামী আইনের আলোকে কারাদণ্ডের পরিবর্তে কিসাস প্রযোজ্য হবে।[৭]

১৪. ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশুর তত্ত্বাবধান ও ভরণপোষণ (ধারা-১৩)

এ আইন অনুসারে ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশুকে মাতা তার তত্ত্বাবধানে রাখতে পারবে, শিশুটি পিতৃপরিচয়ে বড় হতে পারবে এবং এ শিশুর ভরণপোষণ রাষ্ট্র বহন করবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণে মা সন্তান লালন-পালনের অধিক হকদার। ধর্ষণের ফলে (জোরপূর্বক ধর্ষণ) জন্মলাভকারী শিশুকে মা তার তত্ত্বাবধানে রাখতে পারবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ اَبُوهُ اَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

[তালাকপ্রাপ্তা] জনৈকা স্ত্রীলোক নবী ﷺ এর কাছে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ পুত্রের জন্য আমার উদর ছিল আধার এবং আমার কোল ছিল তার জন্য আশ্রয়স্থল এবং আমার স্তন ছিল তার জন্য পানপাত্র, অথচ তার পিতা বলছে যে, আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবে। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন– 'যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে, ততক্ষণ তার ব্যাপারে তুমি অধিক হকদার।"(Ibn Ḥanbal 2001, 6707)

এ হাদীসের ওপর কিয়াস করে এক্ষেত্রেও মাকে সন্তানের লালন-পালনের হকদার বিবেচনা করা হবে। একইভাবে প্রচলিত আইনের ন্যায় ইসলামী আইনেও এ

৪. বিস্তারিত ধারা ১.১ ও ১.৩ এ দ্রষ্টব্য।
৫. বিস্তারিত ধারা ১.৫ এ দ্রষ্টব্য।
৬. বিস্তারিত ধারা ২ নং এ দ্রষ্টব্য।
৭. বিস্তারিত ধারা ২ নং এ দ্রষ্টব্য।

সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত থাকবে। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

আমি মুমিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিজনের জন্য। কেউ ঋণ অথবা পোষ্য (অসহায় শিশু অথবা বিধবা স্ত্রী) রেখে গেলে তার দায়দায়িত্ব আমার ওপর (Abū Dāwūd 1420H., 2954)।

১৫. নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় সংবাদপত্রে প্রচার করা নিষেধ (ধারা-১৪)

এ আইনে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় সংবাদপত্রে প্রচারকারীর জন্য কারাদণ্ডের পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ইসলামী আইনে এ বিষয়ে সরাসরি হুদুদ না থাকলেও মানহানি বিবেচনায় বিচারক তাযিরি শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড দিতে পারবেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণে এমন কোনো সংবাদ প্রচার করা যাবে না, যাতে অন্য কারো মানহানি হয়। ইসলামী নীতি হলো: হয়তোবা তুমি ভালো কথা বলবে অথবা চুপ থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا﴾

মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে (তার কথা ব্যতীত)। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (al-Qur'ān: 4:148)।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার উচিত ভাল কথা বলা অথবা চুপ থাকা। (al-Bukhārī 1422 H., 6018)

একইভাবে ইসলাম অন্যের দোষ প্রচার করার চাইতে গোপন রাখতেই উৎসাহিত করে; যদি তা সমাজ বিশৃঙ্খলামূলক কোনো ঘটনা না হয়। সাংবাদিক কখনো কারো দোষ অন্বেষণ করবে না এবং সংবাদ সংগ্রহে গোপনীয়তা রক্ষা করবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ﴾

তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু (al-Qur'ān: 49:12)।

১৬. মিথ্যা মামলার জন্য কারাদণ্ড ও অতিরিক্তি অর্থদণ্ড (ধারা-১৭)

ইসলামী আইন অনুসারে, মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান বিবাদি অবস্থা, মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

১. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি কুখ্যাত অপরাধী বা সন্ত্রাসী হয়, তাহলে যেসব অপরাধ সচরাচর প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য (যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ প্রভৃতি) সে সবের জন্য তাকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে স্বীকারোক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রহার করাও যেতে পারে, (Editorial Board 1995, 16:92) বন্দী করেও রাখা যেতে পারে (Ibn al-Humām N.D., 5:352)।

২. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে জনসমাজে সুখ্যাত হয়, তা হলে তাকে কোনভাবে নিছক অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন রূপ শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রমাণিত করতে না পারে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে। যাতে কোন অসৎ ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের লোকদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে (Ali 2015, 327-328)।

৩. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি অসৎ জানা না যায়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে, যতক্ষণ না তার অবস্থা স্পষ্ট হবে (Ali 2015, 328)।

৪. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি না জানা নাই, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য দুজন সাধারণ লোক কিংবা একজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে কুখ্যাত অপরাধী ও সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রে বিচারক কিংবা শাসকের অবগতিই যথেষ্ট (Editorial Board 1995, 14:95)।

৫. যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে হয়রানি কিংবা অপমানিত করার জন্য কোন মামলা দায়ের করে এবং বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, বাদি অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছে, তাহলে বিচারক তাকে নীতি শিক্ষাদানমূলক যে কোন শাস্তি দান করবেন। আর এ ধরনের শাস্তিসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাস্তি হল কারাদণ্ড। এ ধরনের শাস্তির কারণ হল, যাতে সমাজে অসৎ ও মতলববাজ লোকদের এ ধরনের মামলা দায়েরের প্রবণতা বেড়ে না যায় (Ibn Farḥūn N.D., 2:300)।

১৭. দ্রুত তদন্তে অবহেলার শাস্তি (ধারা-১৮, ২০)

এ আইনে দ্রুত তদন্ত কার্য সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্রুত তদন্তে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কারো অবহেলা পরিলক্ষিত হলে চাকুরিক্ষেত্রে বিভাগীয় তদন্ত ও চাকুরিবিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনা হলো- বিচারক বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বিচার বিলম্বিত করেন, তবে তিনি কুফরী করলেন, অন্য একদলের মতে, উক্ত বিচারক কাফির হবেন না, তবে বড় ধরনের অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে (Ibn Farḥūn N.D., 2:300)। এক্ষেত্রে তাযিরি শাস্তি হিসেবে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যাবে এবং চাকুরীতে প্রমোশন স্থগিত করে রাখা বা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেয়া প্রভৃতি শাস্তি দেয়া যাবে (Ali 2015, 321)।

১৮. জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত (ধারা-১৯.২-৪)

এ আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনে জড়িত মূল এবং প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে না, তবে অভিযুক্ত নারী হলে অথবা ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে যে তিনি পালিয়ে যাবেন না, তবে জামিন দিতে পারবেন। ইসলামী আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে আটক করা যাবে না। তবে অপরাধ প্রমাণিত হলে, শাস্তি কার্যকরের পূর্ব পর্যন্ত আটক রাখা যাবে। তবে যদি বিচার মনে করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিনে থাকলে অপরাধের পুনরাবৃত্তি ও অশ্লীলতা ছড়াতে পারে, সেক্ষেত্রে তাকে আটক রাখা যাবে। যেমন- পেশাদার গায়ক-গায়িকা দ্বারা যেহেতু সমাজে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা সৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকে, তাই তাকে বন্দী করে রাখা জায়িয, যতক্ষণ না সে বিশুদ্ধ তাওবা করে সুন্দর ও সুস্থ জীবন যাপনে ফিরে আসে (Ibn al-Humām N.D., 5:352)। সুতরাং জামিন অযোগ্য বিষয়টি ইসলাম সমর্থন করে না, তবে বিচারক প্রযোজ্য মনে করলে আটক রাখতে পারবেন।

১৯. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি (ধারা-২০,২৬,২৭)

এ আইনের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা রয়েছে, এক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং অভিযোগ প্রাপ্তির ১৮০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়েছে। ইসলামী আইনেও দ্রুত বিচার ফায়সালা করার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে যেসব মোকদ্দমা উপস্থাপিত হতো তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে তার মীমাংসা করে দিতেন। অবশ্য কেনো কোনো সময় সার্বিক পরিস্থিতি, মামলার ধরন, অপরাধীর অবস্থা ও জনকল্যাণ বিবেচনা করে বিচারের রায় বিলম্বে কার্যকর করা হতো। যেমন তিনি যিনার অপরাধে অপরাধী এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর শাস্তি কার্যকর করণে বিলম্বিত করেন (Muslim 1999, 4283-4)।

দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন ও মুয়াবিয়া রা.-এর খিলাফতকালের বিচার ব্যবস্থায় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে তিনি আস-সাইব ইবন ইয়াযীদ রা. কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন, "আমার পক্ষ থেকে কিছু কাজ সম্পন্ন করো।" অতঃপর তিনি এক-দুই দিরহামের (মূল্যমানের মামলাগুলো) ব্যাপারে ফায়সালা করতেন (al-Haythamī 1988, 4:196)।

এ থেকে নির্দিষ্ট বিচারপতির অধীনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন ও তাতে বিচার্য মামলার ধরন নির্দিষ্ট করার ইঙ্গিত রয়েছে। অতএব, সাহাবীগণের এ পন্থা অবলম্বন করে বর্তমান সময়ে অসংখ্য নতুন নতুন অপরাধ প্রবণতা রোধকল্পে দ্রুত বিচারের ট্রাইব্যুনাল গঠন শরীয়তের দৃষ্টিতে দূষণীয় নয় (Ruhul Amin 2013, 15)। অপরাধ ও মামলার ধরন অনুযায়ী পৃথক ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ ও বিচারক নিয়োগ দেয়া প্রসঙ্গে

কাযী আবূ ইয়ালা বলেন, "যদি রাষ্ট্রপ্রধান কোনো এলাকায় দুজন বিচারক নিয়োগ করেন, আমি মনে করি, যদি তাদের একজনকে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের বিচারের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং অন্যজনকে ভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়, যেমন একজনকে ঋণ বা আর্থিক লেনদেন বিষয়ে ও অন্যজনকে বিবাহ বা পারিবারিক বিষয়ে বিচার-ফায়সালা করার দায়িত্ব দেয়া হয়, তবে তা বৈধ। তারা শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিচার করার দায়িত্বে নিয়োজিত হবেন (al-Farrā 2000, 69)।

২০. অপরাধী সনাক্তকরণ, মামলার শুনানী ও সাক্ষী (ধারা-২১-২৫)

অপরাধী সনাক্তকরণ শাস্তি প্রয়োগের অন্যতম পূর্বশর্ত, প্রচলিত আইনে এ সম্পর্কে গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। এ আইনে ব্যভিচারসহ সকল অপরাধ প্রমাণে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের অনুসরণে দুইজন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। এটি দুটি পর্যায়ে ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রথমত, ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণে ইসলামী আইনে চারজন পুরুষ সাক্ষীর শর্তারোপ করা হয়েছে। যদি সাক্ষীদের সংখ্যা চারজনের কম হয় তাহলে ধর্ষণের শাস্তি কার্যকর করা যাবে না; বরং যারা সাক্ষ্য দিবে তাদের ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾

যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। (al-Qur'ān: 24:4)

দ্বিতীয়ত, ব্যভিচার ভিন্ন অন্য অপরাধের ক্ষেত্রে দুইজনের সাক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ইসলামী আইন সমর্থিত। কেননা ইসলামী সাক্ষ্য আইনের সাধারণ নীতিমালা হলো দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না (Mumin 2009, 92)।

তৃতীয়ত, প্রচলিত আইনে শাস্তি আইনে সাক্ষীর ক্ষেত্রে "নারী' ও "পুরুষ" কোন বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। আবু উবাইদ তাঁর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে যুহরী র.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সুন্নাত এভাবে চলে আসছে যে, হুদূদ, বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্যদান জায়েয নয় (Editorial Board 2012, 241)। তবে এমতটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য নয়; বরং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণে কোনো বাধা নেই (Editorial Board 2018, 268)। এক্ষেত্রে ইসলামী সাক্ষ্য আইনের সাধারণ নীতি হলো দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অর্থনৈতিক লেনদেনে সাক্ষী রাখার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত কুরআনের বাণী:

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾

তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী রাখো। যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী রাখো (al-Qur'ān: 2:282)।

তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের যুগে একজন নারীর সাক্ষ্যকেও একজন পুরুষের সমান সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের ব্যতিক্রমী নজীর রয়েছে, যদিও তা খুবই সামান্য। তদুপুরি যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগেই এ বিষয়টিতে রুখসত দেয়ার নজীর রয়েছে, সুতরাং বিচারক চাইলে এ বিষয়ে রুখসত দিতে পারবেন (Mumin 2009, 103-106)।

এছাড়াও ইসলামী আইনে সাক্ষীকে মুসলিম, ন্যায়পরায়ণ, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, বাকশক্তিসম্পন্ন, নিঃস্বার্থ, প্রভাবমুক্ত ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে; (Ibid, 93-98) যা প্রচলিত আইনে অনুপস্থিত।

২১. আপিল (ধারা-২৮)

এ আইনে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করতে পারবে। ইসলামী আইনেও আদালতে বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে মামলার বাদী অথবা বিবাদী ন্যায়বিচার পাবার উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। এ প্রসঙ্গে দলিল আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি রা. বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন, সেখানে এক সম্প্রদায় সিংহ স্বীকার করার উদ্দেশ্যে উঁচু ভূমিতে গর্ত খনন করল এবং একটি সিংহ সেই গর্তে পতিত হল। এক ব্যক্তি উক্ত গর্তে পড়ে গেল এবং সে পড়ে যাবার সময় আরেকটি লোককে ধরার কারণে সেও গর্তে পড়ে গেল এবং ধরাধরি করতে করতে আরো দু'জন গর্তে পড়ে তারা মোট চারজন পড়ে গেল। সিংহ তাদের আঘাত করায় তারা সবাই নিহত হল। নিহতদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কুপ খননকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। ফলে উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হল। তিনি বলেন, আমি তাদের নিকট এসে বললাম, তোমরা কি দু'শ লোককে হত্যা করবে চার ব্যক্তির জন্যে? তোমরা এসো, আমি তোমাদের মাঝে বিচার ফায়সালা দেই। তোমরা যদি সন্তুষ্ট থাকো, তবে এটাই তোমাদের জন্যে ফায়সালা ধরে নেবে। আর যদি মানতে অস্বীকার করো, তবে তোমরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উত্থাপন করতে পারো। কেননা তিনি বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন, প্রথম ব্যক্তির জন্য দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য দিয়াতের অর্ধেকএবং চতুর্থ ব্যক্তির জন্য পূর্ণ দিয়াত। তিনি ঐ দিয়াত ঐ চার গোত্রের ওপর ধার্য করেন, যারা গর্তের কিনারায় উপস্থিত হয়েছিল। এ ফায়সালায় তাঁদের কেউ অসন্তুষ্ট হল এবং কেউ সন্তুষ্ট হল। অতঃপর তারা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মাঝে বিষয়টি ফায়সালা কবে দেব। একজন বলল, আলী রা. আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিয়েছেন এবং সে তাঁর নিকট আলী রা.-এর ফায়সালা বর্ণনা করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আলী যা ফায়সালা করেছে সেটাই যথার্থ (al-Bayhaqī 1994, 16175)। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, ইয়ামান প্রদেশের প্রাদেশিক আদালতে প্রাদেশিক শাসক ও বিচারক আলী ইব্ন আবি তালিব রা. কর্তৃক রায়কৃত মোকদ্দমাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উচ্চ আদালতে আপিল করা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উচ্চ আদালতে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখা হয়। সুতরাং বর্তমান যুগেও কেউ নিম্ন আদালতের রায়ে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবেন।

২২. বিচারকার্যে অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রিতা (ধারা-৩১.ক)

এ আইনে বিচারকার্যে অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রিতার জন্য ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (বিচারক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) বিরুদ্ধে চাকুরি বিবেচনায় বিভাগীয় শাস্তি প্রয়োগ করার নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো বিচারকে বিলম্বিত করা ন্যায় বিচারের পরিপন্থি, যাতে বাদী ন্যায়-বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলাম এমন সকল কাজকেই নিষিদ্ধ করে, যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না (Ibn Mājah 1998, 2341)।

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কারো যে কোনো ধরনের অনিষ্ট সাধন করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে এ হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব। বাদী যদি অন্যায়ভাবে বিবাদীকে ফাঁসানেরার চেষ্টা করে তখন দ্রুত বিচারের মাধ্যমে বিবাদীর অনিষ্ট অতি দ্রুত রোধ করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে বিবাদী যদি অপরাধী হয় তবে বাদীর অধিকার দ্রুত আদায়ের মাধ্যমে তার থেকে অনিষ্ট প্রতিহত করা যায় (Ruhul Amin 2013, 13)। এজন্যই হানাফী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মতে দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন করা ফরয এবং ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মতে ওয়াজিব (Ibn 'Ābidīn 1992, 5:550)। বিচার কার্যে দীর্ঘসূত্রিতা অবহেলার জন্য তাযিরি শাস্তি হিসেবে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যাবে এবং চাকুরীতে প্রমোশন স্থগিত করে রাখা বা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেয়া প্রভৃতি শাস্তি দেয়া যাবে (Ali 2015, 321)।

ফলাফল ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী বিবেচনায় 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০'-এর সাথে ইসলামী আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনার ফলাফল ও ফলাফলে দৃশ্যমান বিদ্যমান আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ধারাসমূহ সংশোধনের সুপারিশ নিম্নোক্ত সারণীতে তুলে ধরা হলো-

ধারা	অপরাধ	শাস্তি	ইসলামী বিধানের সাথে মিল:অমিল ও সংশোধনের সুপারিশ
৪.১	দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটানো	মৃত্যুদণ্ড	ইসলামী কিসাস আইনের সাথে মিল।
		যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড	ইসলামী কিসাস বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে নিহতের উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করলে দিয়াত অথবা দিয়াত ব্যতীতই মৃত্যুদণ্ড রহিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচারক তাযিরি শাস্তির আওতায় চাইলে কারাদণ্ড দিতে পারেন।
		অর্থদণ্ড (১ লক্ষ টাকা)	ইসলামের দিয়াতের বিধানের সাথে মিল। অধিকাংশ ইমামের মতে দিয়াত ব্যতীত অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়। তবে এটি ন্যূনতম ২০ লক্ষ টাকা হওয়া উচিত।
৪.১	দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা	মৃত্যুদণ্ড	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড (১ লক্ষ টাকা)	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
৪.২.ক	দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমণ্ডল, স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত	মৃত্যুদণ্ড	ইসলামী কিসাস আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
		যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড	ইসলামী কিসাস আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
		অর্থদণ্ড (১ লক্ষ বা ৫০ হাজার টাকা)	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
৪.২.খ	দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ নিক্ষেপের ফলে যেকোনো অঙ্গহানি	সর্বোচ্চ ১৪ কিন্তু সর্বনিম্ন ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড	ইসলামী কিসাস আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
		অর্থদণ্ড (৫০ হাজার টাকা)	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
৪.৩	দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ নিক্ষেপের ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি না হলে	কারাদণ্ড (সর্বোচ্চ ৭ কিন্তু সর্বনিম্ন ৩বছর)	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড (৫০ হাজার টাকা)	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
৭ ও ৮	নারী ও শিশু অপহরণ	যাবজ্জীবন বা সর্বনিম্ন ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	ইসলামী আইন সমর্থন করে।
		অর্থদণ্ড	মুক্তিপণ আদায়ের জন্য নারী ও শিশু

			অপহরণ বিবেচনায় তাযীরি শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড দেয়া যাবে।
৯.১, ৯.২, ৯.৩	নারী বা শিশুকে ধর্ষণ ও গণধর্ষণ	মৃত্যুদণ্ড	ইসলামী হুদুদ আইনে ধর্ষকবিবাহিত অথবা অবিবাহিত বিবেচনায় শাস্তির পার্থক্য রয়েছে।
		যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড	ইসলামী হুদুদ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
		অর্থদণ্ড	ইসলামী হুদুদ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
৯.৪.খ	ধর্ষণের চেষ্টা	সর্বোচ্চ ১০ বছর কিন্তু সর্বনিম্ন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
৯.৫	পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের জন্য হেফাজত প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তিদের শাস্তি	সর্বোচ্চ ১০ বছর কিন্তু সর্বনিম্ন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
৯.ক	নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা	সর্বোচ্চ ১০ বছর কিন্তু সর্বনিম্ন ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
১০	যৌনপীড়ন (শ্লীলতাহানী)	সর্বোচ্চ ১০ বছর কিন্তু সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
১১.ক	যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো	মৃত্যুদণ্ড	ইসলামী কিসাস আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
১১.ক	যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
১১.খ, গ	যৌতুকের জন্য যখম	কারাদণ্ড	ইসলামী কিসাস আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।

১২	ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানি	মৃত্যুদণ্ড	ইসলামী কিসাস আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
		যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড	ইসলামী কিসাস আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
১৩	ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশু	শিশু মাতার তত্ত্বাবধানে রাখতে পারবে, পিতৃপরিচয়ে বড় হতে পারবে এবং ভরণপোষণ রাষ্ট্র বহন করবে	ইসলামী আইন সমর্থন করে।
১৪	নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় সংবাদপত্রে প্রচার	২ বছর কারাদণ্ড	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
১৭	মিথ্যা মামলা	৭ বছর কারাদণ্ড	ইসলামী তাযিরি আইনের সাথে মিল।
		অর্থদণ্ড	অধিকাংশ ইমামের মতে অর্থদণ্ডের শাস্তি বৈধ নয়।
১৮	দ্রুত তদন্তে অবহেলা	চাকুরিবিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	ইসলামী আইন সমর্থন করে।
১৯.২-১৯.৪	জামিন অযোগ্য অপরাধ	সাধারণত বিবাদী জামিন পাবে না	ইসলামী আইন পুরোপরি সমর্থন করে না, বিষয়টি বিচারকের এখতিয়ারাধীন।
২০, ২৬, ২৭	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি	আশি দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে	ইসলামী আইন সমর্থন করে।
২১-২৫	অপরাধী সনাক্তকরণ, মামলার শুনানী ও সাক্ষী	প্রচলিত ফৌজদারী অপরাধের ন্যায় বিচার পরিচালনা	ইসলামী আইনের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক।
২৮	আপিল	বাদী ও বিবাদীর আপিলের সুযোগ	ইসলামী আইন সমর্থন করে।
৩১.ক	বিচারকার্যে অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রিতা	চাকুরিবিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	ইসলামী আইন সমর্থন করে।

উপসংহার

নারী ও শিশু নির্যাতন ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে এ নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ইসলাম নির্দেশিত আইনের সাথে প্রচলিত আইনে বিভিন্ন ধারায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত, শাস্তিমূলক ধারাসমূহে মৃত্যুদণ্ডের বিধানে ইসলামের কিসাস আইনের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ডের বিষয়টি অধিকাংশ ইসলামী আইনজ্ঞ সমর্থন করেননি। একইসাথে বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষীর সংখ্যা ও নারী-পুরুষ ভেদ না থাকা, জামিন অযোগ্য বিবেচনা করা ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। বিচারক অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যর্থতায় বিভাগীয় শাস্তির বিষয়টি ইসলামী তাযিরি শাস্তির আওতায় প্রয়োগযোগ্য। সর্বোপরি, প্রবন্ধে নির্দেশিত সুপারিশমালার আলোকে বিদ্যমান আইনের সংশোধন করা হলে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলাম নির্দেশিত বিষয়াদি বাস্তবায়নে বিদ্যমান আইনটি একটি দৃঢ় ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

Biblography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Abū 'Abd Allāh Sulimān Ibn al-'Ash'ath Ibn Isḥāq al-Sijistānī. 1420H. *al-Sunan*. Beirut : Maktaba 'Aṣriyah.

al- Ṣābūnī, Muḥāmmad 'Alī. 1980. *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Damascus: Maktaba al-Ghazālī.

al-Bayhaqī, Aḥmad Ibn Ḥusain. 1987. *al-Sunan al-Ṣughrā*. Pakistan: Darun Nashar.

- 1423H. *Shu'ab al-Īmān*. India:: Dār al-Salafiyyah.
- 2003. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 1422 H. *al-Jāmi' al-Ṣahīh*. Beirut: Dār al-Tawq al-Najāh.

al-Farrā, Abū Ya'lā Muḥammad Ibn al-Ḥusain. 2000. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Ḥajāwī, Abū al-Najā Sharf al-Dīn Mūsā. ND. *al-Iqnā'*. Egypt : .

al-Ḥaṭṭāb, Shams al-Dīn Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Muḥammad. ND. *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar al-Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr.

al-Haythamī, Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn 'Alī Ibn Abī Bakr Ibn Sulaimān. 1988. *Majma' al-Zawāid wa Manba'u al-Fawāid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ali, Ahmad. 2015. *Islamer Sasti Aien*. Dhaka: Bangladesh Islamic Centre

al-Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad Ibn ʻAlī al-Rāzī. 1405H. *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī.

al-Jurajānī, ʻAlī Ibn Muḥammad. *al-Taʻrīfāt*. 1405H. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʻArabī.

al-Kāsānī, ʻAlā al-Dīn Abū Bakr Ibn Masʻūd. ND. *Badāiʻ al-Ṣanāiʻi fī Tartīb al-Sharāiʻ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah

al-Mardāwī, ʻAlā al-Dīn Abū al-Ḥasan ʻAlī Ibn Sulaimān. ND. *al-Inṣāf fī Maʻrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī

al-Maẓharī, Muḥammad Thanā Allāh. 2004. *Tafsīr al-Maẓharī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī

al-Sarakhsī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Sahl Abū Bakr. 1993. *al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Maʻrifah.

al-Ṭabarānī, Sulaymān Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb. N.D. *al-Muʻjam al-Awsaṭ*.Cairo: Dār al-Ḥaramain.

Editorial Board. 1995. *al-Mawsūʻah al-Fiqhiyyah*. Kuwait : Ozārah al-Awqāf.

Editorial Board. 2012. *Islamer Paribaric Ain [vol-1] (AL-Mawsuatul Fiqhiyah)*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Center.

Editorial Board. 2018. *Bidhibaddho Islami Ain*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Ibn ʻĀbidīn, Muḥmmad Amīn Ibn ʻUmar. 1992. *Radd al-Muḥtār*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad. ND. *Fatḥ al-Qadīr*. Beirut: Dār Fikr.

Ibn al-Mānẓūr, Abū al-Faḍl Muḥammad Ibn Mukrim Ibn ʻAlī. 1414H. *Lisān al-ʻArab*. Beirut: Dār Ṣādir.

Ibn Farḥūn, Ibrāhīm Ibn ʻAlī Ibn Muḥammad. ND. *Tabṣirah al-Ḥukkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Ibn Ḥanbal, Abū ʻAbd Alllāh Aḥmad Ibn Muḥammad. 2001. *al-Musnād*. Egypt: Muwassasah al-Risālah.

Ibn Mājah, Abū ʻAbdullah Muḥammad Ibn Yazīd. 1998. *al-Sunan*. Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-ʻArabiyyah

Ibn Nujaim, Zayn al-Dīn Ibrāhīm Ibn Muḥammad. N.D. *al-Baḥr al-Rāiq Sharḥ Kanz al-Daqāiq*. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʻAbdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad. 1417H. *al-Mughnī*. Riyāḍ: Dār Ālam al-Kutub

- N.D. *al-Mughnī.* Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī

Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammd Ibn Aḥmad. 1981. *Bidāyah al-Mujtahid*. Beirut: Muwassasah al-Risālah

Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn Abū al-ʻAbbās Aḥmad Ibn ʻAbd al-Ḥalīm. ND. *al-Fatwā al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Ibn al-Qayyim, Abū ʻAbdullah Muḥammad Ibn Abū Bakr Ibn Ayyūb. ND. al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah. Damascus: Maktabah Dār al-Bayān.

J. Fraenkel, N. Wallen & H. Hyun, 2015. *How to Design and Evaluate Research in Educations*. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

MolJPA, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh. 1995. *Nari o Shishu Nirzatan (Bishesh Bidhan) Ain*. Dhaka. Government of Bangladesh

- 2000. *Nari o Shishu Nirzatan Daman Ain*. Dhaka: Government of Bangladesh
- 2003. *Nari o Shishu Nirzatan Daman (Sansodhan) Ain*. Dhaka. Government of Bangladesh
- 2020. *Nari o Shishu Nirzatan Daman (Sansodhan) Ain*. Dhaka: Government of Bangladesh

Mumin, Muhammad Khalilur Rahman. 2009. "Islamer Shakkho Ain" *Gobesonapatra Sankalan-6* . Dhaka: Bangladesh Islamic Center.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 1999. *al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabi

Ruhul Amin, Muhammad. 2013. ''Sharia Aine Druto Bichar Niishpotti : Nitimala O Shortaboli'' *Islami Ain O Bichar*, 9:34.